Vol. 1 | No. 1 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার অভিধান

Volume	1
Issue	1
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
Published online	June 15, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i1.3
Pages	৩৩-৩৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল

Check for updates

কাজী দীনমুহম্মদ

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

Online ISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 1
Number 1
Year 1957

সাহিত্য পত্রিকা: বর্ষা ১৩৬৪ (১৯৫৭)
বর্ষ: ১ সংখ্যা: ১ পৃষ্ঠা: ৩৮-৬৭

DOI 10.62328/sp.v1i1.4

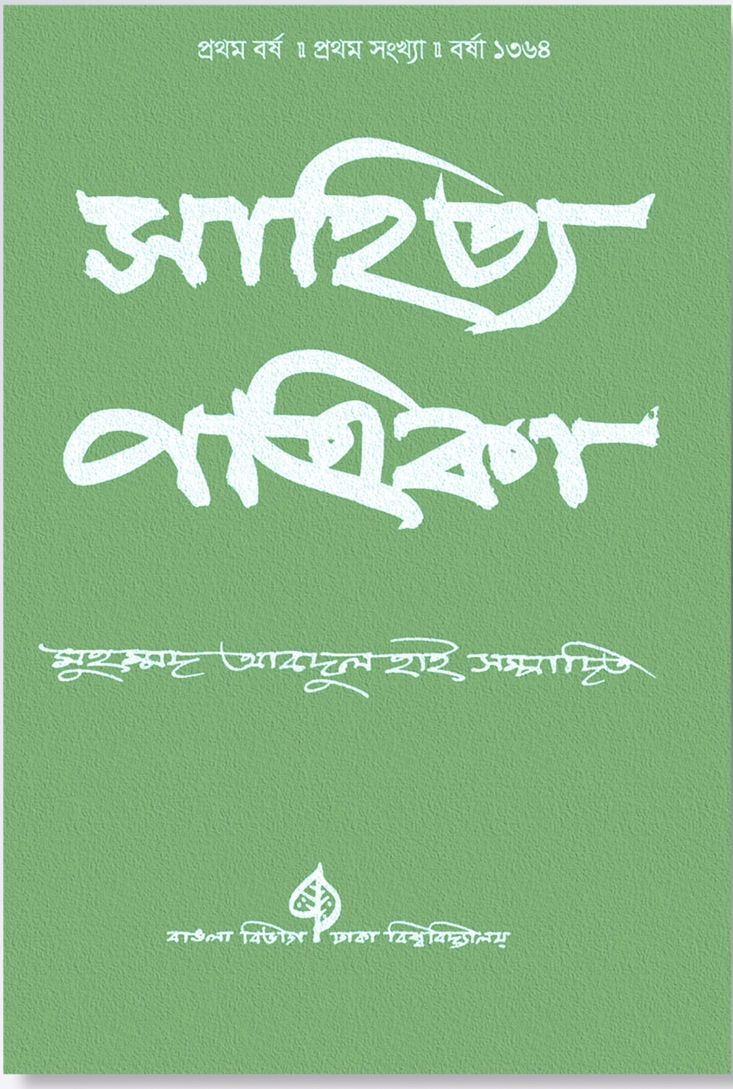

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল

কাজী দীনমুহম্মদ*

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মুসলমানের অবদান বিস্তারে ও ব্যাপকতায়, সৃষ্টি-প্রাচুর্যে ও জনপ্রিয়তায় অন্যান্য প্রসিদ্ধ কাব্যের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। বরং রোমান্টিক কাব্যসৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণই পথ প্রদর্শক। সেই যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলমানদের হাতে এক নবরূপ লাভ করিয়াছিল। আরবী, ফারসী ও হিন্দী সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং ভাব-বৈচিত্র অনুকরণ করিয়া বাংলার মুসলমান কবিরা এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন।

লৌকিক ধর্ম ও দেবদেবীর অত্যাচারে মধ্যযুগের বাঙ্গালী জীবন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের হাসি কান্না সুখ দুঃখ যে দেবতার কাছে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে, মানুষ সে দেবতারই হাতের পুতুল রূপে চালিত হইয়াছে। একটা মোহময়তায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার বুদ্ধি ও বিবেক। হিংসাপরায়ণ হীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন এই চতুর দেবদেবীর রোষকষায়িত দৃষ্টির বাহিরে যে মুক্ত জীবন প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহারই সন্ধান দেন সর্বপ্রথম মুসলমান কবিগণ। বিরাট পুঁথিসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও জীবনী ও অনুবাদ-মূলক কাব্য রচনায় ও মুসলিম কবিগণ কম অগ্রণী ছিলেননা। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, মোহম্মদ খান, সাবিরিদ খান, শাহ্ গরীবউল্লাহ্, সৈয়দ হামযা, কাজী দৌলত, আলাওয়াল, হায়াতমামুদ, শুকুরমামুদ প্রভৃতি কবিগণের নাম প্রথম শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাহারও কাহারও বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও সকল দিকের বিচারে আলাওয়ালের স্থানই সর্বোচ্চ। তিনি সেই যুগের কোন পণ্ডিতের তুলনায় বিদ্যাবত্ত্বায় ও পাণ্ডিত্যে কোনও অংশে কম ছিলেন না। তিনি যে আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যেই রহিয়াছে।[১] ইনি একদিকে যেমন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন, তেমন নানা

---

[১] 'বাস্তবিক এই মুসলমান কবির সমকক্ষ ভাষাবিদ সেইযুগে কোনও কবি ছিলেন না, একথা জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে। — 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পদ্মাবতী প্রথম খণ্ড, পৃঃ ভূমিকা ।।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রাকৃত-পিঙ্গল, যোগশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র। আধ্যাত্মবিদ্যা (তসউউফ), ইসলাম ও হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র ও ক্রিয়াপদ্ধতি, যুদ্ধবিদ্যা, নৌকা ও অশ্বচালনা ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার মত নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত বীর সেযুগে ছিল বলিয়া জানা যায় না।[২]

আলাওয়ালের কাব্য সাধনা মোটামুটি অনুবাদমূলক। তাঁহার রচিত 'পদ্মাবতী' (১৬৫১) হিন্দী কবি মালিক মুহম্মদ জয়সীর উক্ত নামীয় কাব্যের অনুবাদ। ছয়ফলমুল্লক বদিউজ্জমাল' (১৬৫৯) ঐ নামের উর্দ্দু অনুবাদ অথবা মূল ফারসী কিতাব অবলম্বনে রচিত।[৩] 'হপ্তপয়কর' (১৬৬০) পারস্যকবি নেজামী গঞ্জবীর উক্ত নামীয় কাব্যের অনুবাদ। ইউসুফ গাদার রচিত 'তোহফা' নামক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধের অনুবাদ 'তোহফা' (১৬৬৪) এবং নেজামীর 'সেকান্দর নামা'র অনুবাদ ঐ নামীয় পুস্তক (১৬৭৬)। ইহা ছাড়া কবি তদ্‌গুরু কাজী দৌলতের অসমাপ্ত পুঁথি 'সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী' পুঁথির দ্বিতীয়াংশ এবং কিছু বৈষ্ণব এবং ইসলামী মারেফাৎ মূলক পদ্যও রচনা করিয়াছিলেন। এপর্যন্ত ইহা ছাড়া তাহার রচিত আর কোন পুঁথি বা পদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার রচনা মোটামুটি অনুবাদমূলক হইলেও 'তাঁহার অনুবাদ মৌলিক রচনার স্পর্দ্ধা' রাখে। তাঁহার অনুবাদে কোথাও আড়ষ্টতা বা অস্বাভাবিকতা নাই। তাঁহার অনুবাদের প্রায় সকলগুলিই ভাবানুবাদ, হুবহু ভাষান্তরিত রূপ নহে। ভাবানুবাদ বলিয়াই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের ছাপ তাঁহার রচনার সর্বত্র সুস্পষ্ট। কবি নিজেই তাঁহার কাব্যের এক জায়গায় বলিয়াছেন,

এইসূত্রে কবি মোহাম্মদ করি ভক্তি
স্থানে স্থানে প্রকাশিল নিজমন উক্তি॥

---

২ 'বাস্তবিক তাঁহার সমান নানা বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিলেন না। .....মধ্যযুগে তাঁহার সমান এত বহুগ্রন্থ রচয়িতা আর কেহ আমাদের চোখে পড়ে না। ভাষাজ্ঞান ও বহু গ্রন্থ রচনা এই দুই বিষয়ে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশেষ লক্ষণীয় কবি। —ঐ ... পৃঃ ||10-

৩ আলাওয়াল এক কাব্যের আখ্যান ভাগ সংগ্রহ করেছেন সম্ভবতঃ ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবি গহবাছির ঐ নামের উর্দু পুস্তক থেকে। গহবাছি ফারসী আরব্য উপন্যাস থেকে এ গল্প উর্দুতে অনুবাদ করেছেন। — মুহম্মদ আবদুল হাই — সাহিত্যও সংস্কৃতি, পৃঃ ৫৯।

— কবির এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আলাওয়াল মোহাম্মদ জায়সীর *পদুমাবৎ* কাব্যের হুবহু অনুবাদ করেন নাই। 'স্থানে স্থানে' 'নিজ মন উক্তি ও প্রকাশ করিয়াছেন। জয়সীর কাব্যের মূল কাঠামো ঠিক রাখিয়া কবি ইচ্ছামত কবিত্বের রাশ আলগা করিয়া দিয়াছেন। মনে হয় অপর সকল কাব্যেও এই একই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনাকে একবোরে মৌলিক রচনা না বলিতে পারিলেও সেগুলি মোটামুটি যে স্বাধীন রচনা সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারেনা। এই গুণ বেশী থাকায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আলাওয়ালের 'সয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জমাল' কে তাঁহার মৌলিক রচনা বলিয়া উল্লেখ করিতে আপত্তি করেন নাই। সত্যি এরূপ নিপুণ অনুবাদ কম প্রশংসার কথা নয়।'

আমরা আলাওয়ালের 'পদ্মাবতী' কাব্যের আলোচনা করিয়া উপরোক্ত অভিমত গুলির যথোচিত বিচার করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, কাব্যখানি মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয় — স্বাধীন অনুবাদ; এবং কবি তাই ইহাতে মৌলিক কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ ও সময় পাইয়াছেন। কবি আক্ষরিক অনুবাদও করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ রত্নসেনের প্রার্থনা থেকে একটি শ্লোক এবং তৎসহ তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করা চলে। মূল শ্লোক —

মূর্খানাং প্রতিমা দেবঃ বিপ্রদেব হুতাশনঃ।
যোগীনাং প্রার্থনা দেবো দেব দেবো নিরঞ্জনঃ॥

কবিকৃত অনুবাদ-

মুর্খ সকলের দেব প্রতিমা সে আর।
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার॥
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন।
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জনঃ॥

আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। কোরাণের—

'কুল লাও কানাল বাহরু মেদাদাল্লেকালেমাতি রাব্বি লানাফেদাল বাহরু কাবলা আন তান ফাদা কালেমাতু রাব্বি ওয়ালাও জে্ অনা বেমিছলিহি মাদাদা।'—

এই বাণীর অনুবাদ কবি এইভাবে করিয়াছেন :—

সপ্তমহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপাত যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় কাকত॥
এ সপ্ত সাগর আদি যত নদ নদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মহী হয় যদি॥
যত বিধি নর গহ আর বৃক্ষ শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীববন্ত শ্বাস আর বরিষের ধারা॥
যুগ যুগ বসি যদি অস্তুত লেখয়।
সহস্র ভাগের একভাগ নাহি হয়॥

(পদ্মাবতী ৬পৃ)

কবি নিজেই বলিয়াছেন—

এহি বিধি চিহ্ন প্রভু করিয়াযে জ্ঞান।
যেন মতে কোরানেতে করিছে বাখান॥ (৫ পৃ)

'কুলিল্লাহুম্মা মালিকিল মুলকে, তুতিয়াল মুলকা মানতাশাউ ওয়াতানজিউল মুলকা মেম্মান্ তাশাউ, ওয়াতুত্রজ্জু মানতাশাউ, ওয়াজেল্লু মানতাশাউ।'—

এই বাণীর অনুবাদ :

আদি অন্ত সংসারেতে সেই একরাজা।
ত্রৈলোক্যের জীবজন্তু করে তার পূজা॥
সবান 'পর যে যেই সেই সে ঈশ্বর।
যারে চাহে তার ছায়া করে রাজ্যধর॥
নৈরাশ করয়ে তিলে রঙ্কের প্রমাণ।
আর কেহ নাহি তার দোসর সমান॥ (৪)
জীবেরে গড়য় সেযে, গড়িয়া ভাঙ্গয়।
ভাঙ্গিয়া গড়য় পুনি, যদি মনে লয়॥

—'ওয়াতাখ্‌রেজুল হাইয়া মিনাল মাইয়েতে, ওয়া তাখরেজুল মাইতা মিনাল হাইয়ে', এবং

তাত মাতা দারা সূত সকল বর্জিত
দোসর কুটুম্ব নাহি, বান্ধব রহিত॥
আপনি সৃজক সেই, না হয় সৃজন।
যেন ছিল তেন আছে, থাকিব তেমন॥

'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুললাহু কুফুওয়ান আহাদ।' — এর অনুবাদ — এইরূপে স্তুতি খণ্ড, হযরতের ছেফাতের বয়ান, চারি আছহাবের বয়ান- এই সকল পরিচ্ছেদে কোরআন হাদিস ও ইসলামের ইতিহাসে কবির অপূর্বজ্ঞানের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে। কেবল মাত্র অনুবাদেই যে তাঁহার কবিত্বের বেশী স্ফুর্তি ঘটিয়াছে তাহা নয়, বরং রচনা যেখানে মূলের অনুগ হয় নাই—স্বাধীনভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানেই তাঁহার কবিত্ব নিজস্ব পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তিনি যে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্যের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। আর এই সকলের বর্ণনাতেই তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন।

তিনি যে পিঙ্গলাচার্যের অষ্ট-মহাগণের তত্ত্ববিচার করিতেও ওস্তাদ তাহা বুঝা যায় তাহার মগন সগন ইত্যাদির সুদীর্ঘ বর্ণনায়।

মগন যগন আর রগণ সগণ।
ভগণ জগণ অন্তে তগণ নগণ॥
এই অষ্ট-মহাগণ দেখহ বিদিত।
বিরচিয়া কহে তবে গণের চরিত॥

তারপর 'লঘুগুরু জানিলে গণের ভেদ পায়' বলিয়া — লঘুগুরু ব্যাখা করিলেন এবং প্রতিটি গণ ধীরে সুস্থে বর্ণনা করিয়া সংজ্ঞা দিয়া গেলেন।

তিন গুরু হইলে তারে বলিয়ে মগণ।
নিধি স্থির, বন্ধুপ্রাপ্তি হয় ততক্ষণ॥
আদ্য লঘু দুই গুরু হয় অন্তে যার।
তাহারে যগণ বলি বুঝিয়া বিচার॥
মধ্যে লঘু দুই দিকে দুই গুরু হয়।
সেই সে রগণ হয় জানিও নিশ্চয়॥

দুই গণ গুণ কহি মনে করি কল্প।
যগণে সাহস বহু, রগণায়ু অল্প॥
অন্তে গুরু আছো মধ্যে লঘুর প্রচার।
সুনিশ্চিতে জানিও সগণ নাম তার॥
দুই দিকে গুরু একাক্ষর লঘু হেটে।
তাহারে তগণ বলি জানিও প্রকটে॥

গণ-গণের ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের ক্রিয়া ও বিভিন্ন গণের কি কি ফল লাভ হয় তাহার ফিরিস্তি দিয়াছেন। কবি রত্নসেনের মুখে যে বিদ্যা দিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজেরই সম্বন্ধে খাটে।

শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান।
একে একে রত্ন সেন করিল বাখান॥
সঙ্গীত পুরাণ বেদ তর্ক অলঙ্কার।
নানাবিধ কাব্যরস আগম বিচার॥
নিজে কাব্য যতেক করিল নানা ছন্দ।
শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্দ॥
সব বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস।
কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস॥

—এই বিদ্যা রাজা রত্নসেনের থাকুক আর নাই থাকুক আলাওয়ালের যে ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবির পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাও তাঁহারই জন্য প্রযোজ্য ।

আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুস্থানী।
নানা গুণে পারগ সঙ্কেত জ্ঞাতা গুণী॥
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা।
শিল্প গুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা॥

শাস্ত্রজ্ঞান প্রমাণ করিবার জন্য নায়ককে (তথা কবিকে) অষ্ট-নায়িকার লক্ষণাদি বর্ণনা করিতে হইল।

অষ্ট-নায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া।
যেমত লক্ষণ তার শুন মন দিয়া॥

আছো-নারী খণ্ডিতা, দ্বিতীয়া অভিসারী।
তৃতীয়া বাসক শয্যা, বিপ্রলব্ধা চারি॥
পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা, কলহান্তা ষষ্টমে।
স্বয়ং দূতিকা ভেদ জানিও সপ্তমে॥
স্বাধীন ভর্তিকার অষ্টমে লৈল নাম।
যাহার যে মত গুণ শুন অনুপাম॥—

বলিয়া অষ্ট-নায়িকার গুণাগুণ বর্ণনা করিলেন। এবং তত, বিতত, শুষির, ঘন, অনাহদ — এই পঞ্চ শব্দের 'চরিত' পাঠ করিলেন। এইভাবে সঙ্গীত দর্পনের পরিচয় দিতেও তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৈষ্ণব বিধিমত রত্নসেনের দশ অবস্থার বর্ণনা করিয়া দশমী দশায় নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে কবি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। ওঝা বৈদ্য আসিয়া বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে।

কেহ নাড়ী চাহে কেহ নাসিকাপবন।
কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চরণ॥
পরীক্ষিয়া নাড়িকা চাহিল গুণিগণে।
নির্মল চন্দ্র সূর্য আপনা ভবনে॥
সঞ্চার নাহিক কিছু কফ বাত পিত।
কি হেতু চমকে মনে অঙ্গ পুলকিত॥

পদ্মাবতীর দশমী অবস্থায় কবি যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া কোন ভেষজ কবিরাজও চিকিৎসা শাস্ত্রে আলাওয়ালের ত্রুটি ধরিতে পারিবেন না। সাধারণ লোক ইহা হইতে কিছু কবিরাজী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবেন।

কোন সখী পাক তৈল শিরেতে ঢালন্ত।
কেহ কেহ হস্ত পাদ ঘসি তেল দেও॥
কেহ আনি অঙ্গে ছিটে-শীতল চন্দন।
বিচনী লইয়। কেহ দোলায় পবন॥
কোন সখী শীঘ্র জল আনি দেন্ত মুখে।
নাসা অগ্রে হস্ত দিয়া কেহ শ্বাস দেখে॥

সিংহ তৈল গজধারা ঝাম্পে ভৃঙ্গ তৈল॥
বাল্য তৈল কচি নষ্টা বেলা খেলা তৈল।
পাদরি শুধরা মাজা মার্জনা যে তৈল।
নানা জাতি তৈল দিল শান্তনা হইল॥

—তৈলের ফিরিস্তি শুনিতে আধুনিকা পদ্মাবতীদের মনোহরণ হইবে না বটে, কিন্তু প্রাচীনাদের মধ্যে এখনো বোধ করি কাড়া কাড়ি পড়িয়া যাইবে

'যোগী খণ্ডে' কবির যোগশাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

রাজ্যপাট তেজিয়া নৃপতি হইল যোগী।
করেত কিংগরী লই বাজায় বিয়োগী॥
শিরে জটা কর্ণে মুদ্রা ভস্ম কলেবর।
কক্ষে সিঙ্গা ডম্বরু ত্রিশূল লৈয়া কর॥
মেথালি ধান্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা।
কান্থা চক্র আপার বসিতে মৃগছাল॥
চকমক পাথর আর পায়েত পারি।
হস্তেতে দ্বাদশ লৈল বটুয়া ধান্ধারি॥ (১০৭)

সত্যব্যাখ্যা, মুখব্যাখা ও নিদ্রাব্যাখ্যায় যে চমৎকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা তৎকালীন সাহিত্যে সাধারণতঃ মিলেনা। পদ্মাবতীর বিবরণ শুনিবার জন্য রত্ন আগ্রহে শুককে বলিতেছেন, —

সত্য কহ শুক বর সত্য জগমূল।
সত্যের কারণে তোর বদন রাতুল॥
সত্যতে বান্ধিছে সৃষ্টি সত্যবাদীজন।
সত্যহতে লক্ষ্মী বল জানিও কারণ॥
যথা সত্য তথাতে সাহস বৃদ্ধিপায়।
সত্য হইতে সতী নারী স্বামী সঙ্গে যায়॥
সত্য হৈতে সত্যবাদী দুইজগে তরে।
সত্যবাদী জনেরে জগতে স্নেহ করে॥

পক্ষী তার জবাব দিতেছে:

সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ।
পতিতের অসত্য বচন বজ্রাঘাত॥
সমুদ্র বহিএ মাঝে সত্যের কাণ্ডার।
বিনি সত্য বলে উত্তরিতে নারে পার॥

নিদ্রা মাহাত্য বর্ণনা :

নিদ্রা সে পরম সুখ জগত মোহন।
যোগ নিদ্রা হতে সিদ্ধি পায় যোগীগণ॥
ভয় চিন্তা হতে যার বুদ্ধি নহে স্থির।
নিদ্রায় ব্যাপিলে হয় অচিন্ত শরীর॥
ভাগ্য বিপরীত হইলে খণ্ড সব সুখ।
অখণ্ডিত সুখ নিদ্রা না হয় বিমুখ॥
আর যত সুখ কার আছে কার নাই।
নিদ্রাসুখ সর্বভূত ব্যাপিল গোসাঞি॥
নৃপতি কোমল শয্যা সুখ যেন মত।
তেন মনে দুঃখী জন কাটে ভূমিগত॥
কোন বস্তু দিয়া কৰি উপমিব তারে।
যাহার বসতি হৈছে চক্ষের মাঝারে॥
জ্ঞান হীন জনে যেই নিদ্রা নাহি চিনে।
সর্বস্ব হারায় হেন নিদ্রার কারণে॥

শিক্ষিত সমাজের উপর তখন যে বিভিন্ন ধর্মবেত্তাদের প্রভাব ছিল তাঁহাদের নামোল্লেখ গুণাগুণ বর্ণনায় তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিভিন্ন গুরুর সঙ্গে রত্নসেনের তুলনা করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করা হইয়াছে।

শুকে বলে, শুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত।
সব হবে জিনিলা তুমি বিক্রম-আদিত॥
গোপীচন্দ্র নৃপতি জিনিলা তুমি যোগে।
সত্য হরিশ্চন্দ্র নহে তোমার সংযোগে॥

গোরক্ষে আসিয়া তোমা সিদ্ধি দিল হাতে।
তোমারে না পারে জ্ঞানে মছন্দর নাথে॥

আলাওয়ালের দর্শন জ্ঞান ও ছিল অপূর্ব। আরবী ফারসী উর্দু হিন্দী ও সংস্কৃত যোগশাস্ত্রে যেমন তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তসউউফ বা অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে। এসব স্থলে এমন উচ্চভাবের বিকাশ হয়েছে যে, মনে হয়, কবি গভীর অন্তর্দৃষ্টির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাহ্যিক পাণ্ডিত্য একটা অতিরিক্ত ভূষণ মাত্র। কাব্য সম্পর্কে তাঁহার অভিমত :—

কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভরিপুর।
দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর॥
নিকটেতে দূর যেন পুষ্পতে কন্টিকা।
দূরেতে নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা॥
বন খণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বস।
নিয়ড়ে থাকিয়া ভেকে না জানায় রস॥

এই পৃথিবীর হাটে কাব্যেরও হইল এই পরিচয় কিন্তু বিচিত্র মানব-চরিত্র কে বুঝিবে? একজনের এক এক দিকে লক্ষ্য, এক একদিকে ঝোঁক। বিচিত্র সৌন্দর্যময় এই পৃথিবীতে

কেহ রঙ্গ চাহে, কেহ বিকিকিনি।
কার হয় লাভ প্রাপ্তি, কার হয় হানি॥

এখানে কাহারও লাভ আবার কাহারও লোকসান। দোকানদার সব মহিলা। তাহাদের রূপ সৌন্দর্য সকলের মনোহরণ করে, চোখে চটক লাগায় । তাহারা

কুলুপ লাগায়ে মন হরি লয় বলে।
বাজায় প্রেমের ফান্দে কত শত গলে ।

কিভাবে? — না,

সতীত্ব আঞ্চল বস্ত্রে করিছে করিছে গোপন।
খলের মানস দহে তাহার কারণ॥
যে হেন সুরূপা সব তেহেন চাতুরী।
নিজ প্রিয়তমা ভারে মাত্র কামাতুরী॥

আবার তাহারা—

কোন স্থানে ইন্দ্রজালে দেখয় কুহক।
মিথ্যাবাক্য সৎ করে দেখাইয়া ঠক॥
সেই সত্য চটকে তোষয় যেই নরে।
গাঁঠির সঞ্চিত ধন হরি লয় চোরে॥
সেই জন চতুর কৌতুকে দেখে রঙ্গ।
হরিতে না পারে চোরে নহে মনোভঙ্গ॥

এই জগতের পথ বন্ধুর তেমনি ইহার মধ্যে গহন বন সুউচ্চ পর্বত আর অতি নিম্ন গহ্বর রহিয়াছে।

অধে উর্দ্ধে সে গড় বঙ্কম নব খণ্ড।
উপরে উঠিলে মাত্র নিকটে-ব্রহ্মাণ্ড॥

এমন যে গড়,

নবদ্বারে সেই গড়ে বজ্রের কপাট।
রক্ষিজন জাগয় — রুন্ধিয়া বৈরিবাট॥
পঞ্চ কোতোয়াল সঙ্গে ফিরে অনুচর।
প্রবেশ করিতে নারে-দুর্জন তস্কর॥
কনক শিলার পৈঠা উঠিতে সঞ্চারে।
বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে॥

সেখানে জীবনের চাবি কাঠি লইয়া ঘড়িয়াল নিশিদিন উপবিষ্ট বৎসর মাস দিন পল অনু গননা তাহাচ কাজ।

ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারয়।
জগতে দণ্ডনী দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে।
কি সুখে নিশ্চিন্তে আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে॥
পল দণ্ডে পহরেক দিন চলি যায়।
পথিক নিশ্চিন্ত কেন চলিতে জুয়ায়॥
রহট-ঘড়ির তুল্য-সংসার নিশ্চয়।
উর্দ্ধমুখে ভরে অধ মুখে নিঃসরয়॥

দেহতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা পরে লালন ফকির ইত্যাদির কাছে যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় উচ্চ তবু ভাব ও ভাষার সৌকর্যে অধ্যাত্মবাদীর রস পিপাসা তৃপ্ত করিবে এই প্রাচীন কবির ধ্যানলীন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিময় সুদূরের সংসার। মুর্শিদ। কবি বলিয়াছেন,

দেহের মাঝে ছয়টি রিপু করে আনাগোনা।
নব দ্বারে নবগ্রহ— পাহারা নয় জনা॥
মানুষের গাছ হইতে পাতা খইয়া পড়ে।
দিন ক্ষণ আয়ু মাস ঘড়িয়াল ধরে॥

এ সংসার ক্রীড়াভূমিতে যথেচ্ছ দেখিয়া লও — মানব জনমের এই বয়স আর পাইবেনা। 'আদ্ দুনিয়া মাজরেয়াতুল আখেরাত' — এ দুনিয়া আখেরাতের শষ্য ক্ষেত্র। কাজেই এখানে শষ্যের উৎপাদন যে যার কর্ম অনুযায়ী করিয়া লইলে, 'সময় ফুরাইয়া গেলে হইবে বিনাশ'-এর ভয় থাকিবেনা। এ মেলায় সমান সমান প্রতিযোগী — বন্ধুর প্রীতির সম্পর্কের প্রয়োজন। কবি বলেন,—

শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে গোরী সঙ্গে গোরী।
জোড়ে জোড়ে হার লই খেল বাদ করি॥
জলেত ফেলিয়া হার তোল একেবারে।
হার হারে যেই জনে তুলিতে না পারে॥
বুঝিয়া খেলিবা খেলা রাখিয়া মনত।
নিজহার নহে যেন পর হস্তগত॥
ছদ বন্ধ থাকিতে মেলহ সাবধানে।
খেলা গেলে খেলা নাহি ভাবি চাহমনে॥
যেই ইচ্ছা তেনমতে প্রেম খেলা খেল।
তিল ফুল সঙ্গে যেন ফুলাইল তেল॥

ভাবের সঙ্গে রসের, রসের সঙ্গে রূপের আর রূপের সঙ্গে যৌবনের সমন্বয় না ঘটিলে প্রেমের তথা ভাবের খেলা এ ভবে শোভন হয়না। সাধক ফকির বলেন, —

ভাব বুঝিয়া খেল খেলা,
ফুরিয়ে যখন যাবে বেলা।
ভব নদীর বান ডেকেছে,
দেহ লীলার রোল উঠেছে।
খেলার মত খেল যদি,
সাঙ্গ কর মেলা।

কিন্তু আলাওয়াল এ খেলায় বিভিন্ন ফলের নির্দেশ করিয়া সংসারীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন :

সাথীগণে ডুবদিয়া বিচারিয়া চায়।
কার হাতে মুকুতা, শামুক কেহ পায়॥

আরো: সুখ দুঃখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ,
সম্পদ অন্তে বিপদে
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস?
পূর্ণে গ্রাসে বিধুন্তুদে
তাত মাতা সুত দারা বন্ধু যত
সঙ্কটকাল না উদ্ধারা
এক নিরঞ্জন জগজন সেবন
বিপদতারণ হারা॥

এই সকল শ্লোকে কবির ধর্ম বিশ্বাস ও ধার্মিকতা সম্বন্ধেও একটা নিশ্চিত আভাস পাওয়া যায়। সকল বুঝিয়া শুঝিয়া কবির ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। কোন কিছুরই যেন সমাধানে পৌঁছিতে পারেন না।

পড়িয়া শুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি।
জগৎ জানিল ধন্ধ, পরা কলিবুদ্ধি॥

সত্যই জীবন। অসত্য ধ্বংস। সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। 'কস্ না দিদাম কে গম শুদা আজ রাহে রাস্ত। পারস্য কবির এই বাণীই যেন বাংলায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ।
পণ্ডিতের অসত্য কথা বজ্রাঘাত॥

সারাংশই সত্যের মূল।

দুগ্ধমাঝে ননী আছে জগতে প্রচার।
আউটিলে মাথিলে সে পায় ক্ষীর সার॥

শুধু যে মন্থন করিয়া দুধের ননী — সত্যের সার বাহির করিতে হয় তাহাই নহে, আত্ম শুদ্ধি ও আত্ম শক্তির বলে সৎ গুরুর পরামর্শে তরী তীরে সংলগ্ন হয়।

পন্থ উদ্দেশিয়া—গুরু ধরয় কাণ্ডার।
নিজবলে বাহিলে সাগর হয় পার॥

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' — মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে না পারিলে এ ভাবে উদ্ধার পাওয়া মুস্কিল।

এত জানি তেজিলুং সংসার-সুখ মায়া।
কিবা কার্য সিদ্ধি কিবা নিপাতিত কায়া॥

সাধক কবি বলেন, 'মরার আগে মররে মন'। আলাওয়াল বলেন,

জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে।
পুনি কোথা মরণ, কে মরে কেবা মারে॥
আপনা গুরু যোগী, আপনাই চেলা।
আপনে সকল মাত্র, আপনে একেলা॥
যে চাহে করিতে পারে আপনে আপন।
আপনে মরণ সত্য আপনি জীবন॥
আপনা করিয়া নাশ আপে সর্বময়।
আপনি যাহাকে ভাবে সেই আপ হয়॥

সাধনায় যখন আত্ম শুদ্ধি হয়, তখন আপন পর ভেদাবেদ থাকেনা। তাই সকলই আপন মনে হয়। 'অহম্' আর জাগিয়া থাকেনা বলিয়া সেই পরম ব্রহ্মকেই আমার আমিত্বে লীন দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই বলা যায়, 'অহম্, ব্রহ্মাস্মি'— আমিই ব্রহ্ম—। পারস্য সাধক মনসুরের 'আনাল হক' — আমিই সত্য এই বাণীই সাধক কবি আলাওয়ালকে এ ব্যাখ্যা করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। মনসুর হাল্লাজের ছায়া আরো স্পষ্ট দেখা যায়:

বিন্দু বিন্দু হই যত শ্রবিবেক রক্ত।
পদ্মাবতী পদ্মাবতী স্মরিব সতত॥

মনে প্রাণে, দেহের ভিতর বাহিরে যখন তাহার হইয়া যাওয়া যায় — তখন,

খণ্ড অস্থি রন্ধ্রে মোর পবন পরশে।
বংশী প্রায় সেই ধ্বনি বাজিব সুরসে॥
* * *
এখন চিনিল যদি আর কেহ নয়।
তনমন জীব ধন সেই সর্বময়॥
মুই মুই করিতে পতিত হয় কায়া।
সিদ্ধাপদ পাইলে কোথাতে রহে কায়া॥
* * *

অন্ধ মানুষ না বুঝিয়া শুধু চারিদিকে ছুটাছুটি করে।

না বুঝিয়া জলে যেন ধায় অন্ধমীন।
জলে সে জীবন তার, জলে নাহি চিন॥
কাষ্ঠের পুতলি আমি কল শুরু করে।
ভিতরে দোলায় যদি নাচায় বাহিরে॥

বিংশ শতাব্দীর সাধক ও বলিয়াছেন,

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী চালাও আমারে।

প্রেম—

প্রেমের বর্ণনায় কবি তৎকালীন অপরাপর কবি কাহারও তুলনায় কম যান নাই ।

তার মাঝে প্রেম কথা মাধুর্য- অপার।
প্রেম ভাবে সংসার সৃজিল করতার॥
প্রেম বিনে ভার নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেমহন্তে বশ॥
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর॥
* * *

যার ভাব রস দেশ সুখ মোক্ষ কাম।
প্রেম হন্তে সকল যতেক হৈল নাম॥
প্রেমহস্তে পুত্র দারা, -প্রেম গৃহবাস।
প্রেমেতে ধৈর্যতা রূপ, প্রেমেতে উদাস॥
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেমতুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর॥

কবি নিজেই ছিলেন প্রেমের জীবন্ত প্রতীক। তাঁহার কাব্যও প্রেম-পূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? প্রেমের আগুনে পুড়িয়া, অন্তর হইয়াছে নির্মল। প্রেমের কৃপাণে মনের অজ্ঞান-অন্ধকার কাটিয়া 'কাশ্‌ফ্' হইয়াছে।

প্রেম কবি আলাওল প্রভুর বাবক।
অন্তরে অনল পূর্ণ প্রভুর আশক॥
কাটিল মনের ঘোর ভক্তির কৃপাণে।
রসনাতে রস হৈল প্রেমের বচনে॥
প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশয়।
অসাধ্য সাধন মোর গুরু কৃপাময়॥

প্রেমের ফাঁদ বিষম ফাঁদ। একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। প্রেমে ধর্মাধর্ম জাতি-বিচার জ্ঞান থাকে না ।

কেবা কি করিব যত্র ধরম পীরিতি॥
পীরিতি পর্বতভার যদি লৈল স্কন্ধে।
এড়াইতে না পারি বাজিল প্রেমফান্দে॥*

প্রেম যে মানুষকে মানুষের দয়ার ভিখারী করিয়া ছাড়ে সে কথাও কবি ভুলেন মন্ত্রবলে বিবাহ হইলে তাহাতেই 'ভার্যানীর' অধিকার জন্মে না।

---

*প্রেম তুল্য সংসারে কিছু নাই॥
আহার দর্শনে যেন পক্ষী মনে হর্ষ।
পশ্চাতে বাজিলে ফান্দে বড়ই কর্কশ॥
প্রেম ফান্দে বাজিলে মুক্তির নাহিক আশ।
যবে করে ভাবকে সমূলে আত্মনাশ॥

*

কিবা রাণী কিবা দাসী কিবা অন্য জনী।
যাকে স্বামী দয়া করে সেই সে ভার্যানী॥
* * * *
তিল এক দোষে স্বামী হইল বিমন।
স্বামীরে আপনা বলে সেই মূর্খ জন॥
প্রভু প্রেমে দয়ার গৌরব অনুচিত।
সেবা ভক্তি ত্রাসে মাত্র অখণ্ড পিরীত॥

প্রেম যেমন সংসারে অতুলনীয়, ইহার দুঃখও তেমনি দুঃসহ। এই দুঃসহ দুঃখ যে সহিতে পারে তাহার ত্রিলোকে জয়। প্রেম-পথে দুঃখ বিস্তর। এই দুঃখ যে না সহিতে পারে, তাহার প্রেম সার্থক হইতে পারে ন।

তিনলোক বিচারিয়া মনে কৈল সার।
প্রেমের তুলনা দিতে বস্তু নাহি আর॥
প্রেমের কঠিন দুঃখ যেই জনে সহে।
দুই ভাগে তরে হেন নীতিশাস্ত্রে কহে॥
দুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি।
প্রেম দুঃখ সহে যেবা সুপ্রসন্ন বিধি॥
দুঃখ দেখি প্রেম পন্থে না কৈলে গমন।
সংসারেতে নিঃস্বার্থ আইল সেই জন॥

প্রেমের বিষাক্ত দংশনে প্রেমিকের অবস্থা আশঙ্কা জনক হয়, তবু সে পথ ছাড়ে না । নাম শুনিলেই মুর্ছা যায়। সেই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।' কেবল তাহাই নহে,—প্রেমের দুঃখ যন্ত্রনা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে ।

শ্রোত্র গত মাত্র রূপ- সুধারস বোল।
প্রেমের সাগরে শত উঠিল হিল্লোল॥
প্রেম রূপ মূল, প্রেম বিরহের মূল।
অমৃত জড়িয়া বিষ করিল আকুল॥
পরম প্রেমের সিন্ধু অগাধ গভীর।

ক্ষেণেকে ভাওরে ফেলে সমুদ্রের নীর॥

বিষধরে দংশিলে যেহেন লহরয়।
আপাদ মস্তক আদি হৈল বিষময়॥
প্রেমের কঠিন দুঃখ বাতাইব কোনে।
যাহার মরমে সেই মাত্র জানে॥

তাহার কোন কিছুতেই শান্তি নাই। প্রেমের অঞ্জনে তাহার দিব্য দৃষ্টি-খুলিয়া গিয়াছে। সুঃখ দুঃখ—লাভ ক্ষতি সকল তাহার কাছে সমান, বিপদসঙ্কুল বন, তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্র তাহার কাছে এক ।

যার হৃদে প্রজ্জ্বলিত প্রেম হুতাশন।
কিবা তার নিদ্রা-সুখ শয়ন ভোজন॥
*   *   *
যে জনে পড়িল প্রেম সাগর গম্ভীরে।
খল জোল সম দেখে এই সমুদ্রেরে॥
জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প।
অগ্নির সমুদ্র দেখি তাতে দেয় ঝম্প॥
প্রেম ডোরে মন বান্ধি বিরহের টানে।
সাগর অনল গিরি ক্ষুদ্র হেন জানে॥
যদ্যপি সমুদ্র হয় ঘন লহরিত।
না হয় হংসের হিয়া-অধঃ কদাচিত॥
প্রেম পন্থে যাইতে যদি বা মৃত্যু হয়।
জনম সাফল্য সে তুরিতে নিস্তারয়॥
যাহারে সঁপিল জিউ তাতে হই সাঙ্গ।
সিংহ ব্যাঘ্র দেখিয়া বিরহে না দে ভঙ্গ॥
অমুল্য রতন দেখি দ্রব্য বট-প্রায়।
দেবতা রক্ষক যার কিতার উপায়॥

যিনি প্রেমে মুগ্ধ তিনিই অমর। মিলনেই সার্থক। ..প্রেমের পথে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

তাহারে অমর বলি যদি মরি যায়।
অলি পদ্ম মিলিয়া একত্রে মধু পেয়॥

প্রেম পন্থে চলি যদি অন্ত নাহি পায়।
সেই পন্থে ভাবকের মরণ জুয়ায়॥

প্রেমের সার্থকতার পরীক্ষা তার বিরহের তীব্রতায় ও সহনশীলতার আধিক্যে। বিরহের কষ্টিপাথরে টিকিয়াইত বৃন্দাবনের শ্রীমতি যুগে যুগে প্রেমের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

বিরহ শরীরে হইল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত।
বিরহ ঘায়ের পরে ঘাও সুনিশ্চিত॥
বিরহ দুঃখের মাঝে দুঃখ অতিশয়।
বিরহ বিশিখ পরে বিশিথ নিশ্চয়॥
রোগের উপরে রোগ জানিও বিরহ।
দুঃখের উপরে তনু বিরহ-দুঃখসহ॥
শালের উপরে সত্য বিরহ সে শাল।
কালের উপরে শ্রেষ্ঠ বিরহ সে কাল॥
জীবন হরিয়া কালে নেয় একেবারে।
দারুণ বিরহ পুনি সে কালকেমারে॥

বিরহের জ্বালার কি শেষ আছে? বিরহিনী একদিকে জ্বালায় অস্থির, অপর দিকে রত্নসেন বিরহে—

জল বিনে মীন যেন ছটফট করে।
তাহাতে ফেলিল আনি অগ্নির ভিতরে॥
যতেক চন্দন অঙ্গে যেন দিল দান।
বাড়ব অনল সম প্রেম অনুরাগ॥
কাঁচা কাষ্ঠে একদিকে লাগিলে অনল।
আর দিকে হন্তে যেন নিঃসরয় জল॥
*   *   *
কঠিন বিরহ জাল প্রাণের নিকট-কাল,
ত্রিলোক মাঝার ব্যক্ত না করিয়া ঘনঘন হানে বান॥
*   *   *   *

বিচ্ছেদ অনল হইল প্রবল, আপনা হানিয়া মরিমু॥

বিরহে খাঁটি সোনা কেবল উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে।

প্রবল বিরহ যেন তুরঙ্গ তুষার।
কুণ্ডলী করিরা রাখ সেই আসোয়ার॥
যদ্যপি মদন-শর তিলে হানে প্রাণ।
তাহার অধিক সত্য জাতিকুল মান॥
সহিয়া বিরহ দুঃখ রাখ ধর্ম পেম।
যতেক দহায় ঘন বৃদ্ধি পায় হেম॥

কবির বিরহের বর্ণনায় বিদ্যাপতির চেয়ে চণ্ডীদাসকেই বেশী মনে পড়ে

নিদ্রা নাহি আঁখি, নিশি জাগিয়া পোহায়।
বিছুটির পত্র প্রায় শয্যা লাগে গায়॥
মলয়া সমীর, চন্দ্র, শীতল চন্দন।
অঙ্গ পরশয় যেন গ্রীষ্মের তপন॥
কম্প সমানে যায় বিরহ রজনী।
সতত রাতুল আঁখি নিশি জাগরণে॥
প্রেম হন্তে জনমে বিরহ তিনাক্ষর।
পঞ্চাক্ষরে বিরহিনী লক্ষ্য পঞ্চশর॥
যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ মোক্ষ প্রাপ্তিতার আপদ তরিল॥
বিরহ অনলে যার দহিলা পরাণ।
পিতল আঙ্গুটি করে হেমদশবান॥
যাহার বচনে হয় বিরহের মায়া।
কিবা তার রূপ রেখা কিবা তার কায়া॥
আন ভেশ বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর।
গোপন মানিক্য যেন ধুলির ভিতর॥
প্রেম বিরহের লক্ষ্য বর্ণে কবিকুল।
কাব্য ভাব বুঝে যেই বুঝে তার মূল॥

বৈষ্ণবকবির বিরহের দশ অবস্থার কথাও তিনি ভোলেন নাই।

দশমী দশার এবে শুনহ ব্যবস্থা।
কাম হৈ তে ভাবকের যে দশ অবস্থা॥
অভিলাষ প্রথমে, দ্বিতীয় চিন্তা হয়।
তৃতীয় স্মরণ, গুণ কীর্তি চতুর্থয়॥
পঞ্চমে উদ্বিগ্ন হয়, ষষ্ঠমে বিলাপ।
সপ্তমেতে উন্মাদ, অষ্টমেতে ব্যাধিতাপ॥
নবমেতে দুর্দ্দশা, দশমে মৃত্যুবৎ।
বিরহের দশ অবস্থা বুঝহ বেকত॥

ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে আলাওয়ালের পদ্মাবতীর সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, ‘কবি পিঙ্গলাচার্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট-মহাগণের তত্ত্ববিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা বাসক সজ্জা, ও কলাহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট-নায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্যের ন্যায় যাত্রার শুভা-শুভের এবং যোগিণী চক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীনা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশান্তিবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ধরিয়াছেন।’

তিনি নায়ক-নায়িকার রূপের বর্ণনায় একজন বয়স্ক বৈষ্ণব কবি। তাঁহার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা:

উপনীত হইল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুরুর সঙ্গে বচনে রসাল॥
আড় আঁখি বন্ধ দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষেণে ভায় লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥

সমুরয় গীমহার কটির বসন। চঞ্চল হৈল আখি ধৈরজ গমন॥
চোরা রূপে অসঙ্গ অঙ্গেতে আইসে যায়। বিরহ বেদনা ক্ষেণে ক্ষেণে মনে ভায়॥

অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে সঙ্গে। আমোদিত পদ্ম-গন্ধ পদ্মিণীর অঙ্গে॥
অধর মানিক্য তুল্য, দন্তযেনহীরা। হৃদয়ে হইল কুচ কনক জামিরা॥
কেশরী জিনিয়া কটি, মত্তগঞ্জগামী। নূর শশী দেখিয়া মস্তকে ধরে ভূমি॥

অন্যত্র—

সরোবরে আসিয়া পদ্মিণী উপস্থিত। খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত॥
সুগন্ধি শ্যামল ভার ধরণী ছুইল। চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেরিল॥
কিবা মেঘারম্ভে জগ হইল অন্ধকার। বিধুন্তুদ আইল কিবা চন্দ্র গাসিবার॥
দিবস সহিতে সূর হইল গোপন। চন্দ্র তারা লৈয়া নিশি হৈল উপসন॥
ভাবিয়া চকোর আঁখি পড়ি তোল ধন্দ। জীমুত সময় কিবা প্রকাশিত চান্দ॥
হাস্য সৌদামিনী তুল্য, কোকিল বচন। ভুরূযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত গগন॥
নয়ান অঞ্জন দুই সদা কেলি করে। নারাঙ্গি জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে॥

অথবা—

শশীমুখী কন্যার মুকুর নির্মলে। যাহার যেমত রূপ দেখিল সকলে॥
আঁখি পদ্ম দেখিলে নির্মল অঙ্গনীর। রাজহংস গমন, দশন যেন হীর॥
শিরেত কুসুম্ভী চীর মুখেতে তাম্বুল। রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল॥
ভুরূযুগ ধনুক কটাক্ষ তীক্ষ্ণবাণ। নয়ান সন্ধানে মারে থাকিয়া পরাণ॥
অলকের পাশ যেন কমলেতে অলি। সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চলি॥
সতীত্ব আঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন। খলের মানস দহে তাহার কারণ॥
সুকোমল মৃদু তনু অতি সুকুমার। সুগন্ধি তাম্বুল রাখে এহি সে আঁধার॥
দুতিয়ার চন্দ্র যেন নিত্য বাড়ে কলা। দিনে দিনে দেবীর শরীর নির্মলা ॥

কালিদাসের — তিলে তিলে পরিবর্দ্ধমানা সা শশি কলা ইব...........................ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া দেয়।

পদ্মিনী সুন্দরী। কিন্তু কেবল (concrete) সৌন্দর্য বর্ণনায় যখন কবির তৃপ্তি হইলনা তখন তিনি এই রূপের মধ্যে এ্যাবস্ট্রাক্ট দেহ দেখিয়াছেন।

পুষ্পের সুগন্ধি তুল্য পদ্মিণীর তনু। চন্দ্র জ্যোতিহীনহয় প্রকাশিলে ভানু॥
এ তন্ত কামকলার জন্যে নয়, কামগন্ধ নাহি তায়।
আপাদ লম্বিত কেশ কৌস্তুরি-সৌরভ। মহাঅন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব॥

বিরাজিত কুসুম গুঁথিত মুক্তাহার। সজল জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার॥
তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি। বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী॥

সিন্ধুর ফোটা — 'ফুটিল অলকমাঝে ব্যক্ত রক্ত চিন।' ...যেন

'কিবা কষ্টির মাঝে স্বর্ণ রেখা কার। যমুনার মাঝে কিবা সুরসরি ধার॥

কপাল—

ভাগ্যের উদয়স্থলী ললাট-সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর॥
কিমতে বোলিব ভাল তুলনা মৃগাঙ্ক।
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক॥

ভুরু—

ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জাপাই তেজিল কুসুম শর ধনু ॥
ভুরু চাপ, গুনাঞ্জন, বিশিথ কটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া সেই লক্ষ্য॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল॥

চক্ষু—

প্রভারুণ বর্ণ-আঁখি সুচারু নির্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্মনীলোৎপল॥
কাননে কুরঙ্গ, জলে সফরী লুকিত।
অঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত॥
ইষৎ চালনি সুভঙ্গিমা আমি সনে।
ত্রিজগৎ প্রাণী হরে কটাক্ষ সন্ধানে॥

নাসা—

নাসা হেরি শুকপক্ষী গতি বনান্তর।
লাজে তিল কুলুমিনী ধুলায় ধূসর॥

দশন—

দশন ডালিম্ব, ওষ্ঠাধর বিশ্ব ফল।
অতি লোভে মজিশুক রহিল নিশ্চল॥

বিশ্বত তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া।
অতি দুঃখে ডালিম্ব বিদরে নিজ হিয়া॥

অধর—

সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিশ্ব বান্ধুলি সমন বনান্তর॥
রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।
তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে॥

রসনা—

রসনা কমল পত্র কোমল বচন।
ইষৎ হাসিতে করে সুধা বরিষণ॥

কপোল—

সুরঙ্গ কপোল বর্ণ চারু সুললিত।
জিনিয়া কমল পত্র অতি সুশোভিত॥
তার বাম পাশে একতিল মনোহর।
পুতুলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর॥
যেই তিল সেই তিলে হয় দরশন।
তিলে তিলে করি অঙ্গ করয় দাহন॥
নয়ান খঞ্জন কর্ণ হৈতে রেখা শোভে।
চঞ্চু মেলি কন্দরে রহিছে তিল লোভে॥

শ্রবণ—

শ্রবণ যুগল চারু জিনি সিন্ধু সুতা।
জগজন পাতিয়ায় ঝলকে মুকুতা॥

গ্রীবা—

সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার।
লাজে ক্রৌঞ্চ পক্ষী গেল শিখর মাঝার॥

ভূজ—

জিনিয়া কমল দণ্ড ভুজ মনোহর।
নিজকরে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর॥

হৃদয়—

স্বর্ণ স্থালী জিনিয়া হৃদয় পরিপাটি।
কনক কাটারা তুই রাখিছে উলটি॥
দেখিয়া সুন্দর অতি কুচ যুগ ভঙ্গী।
পুরঙ্গ হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গী॥
কনক কলসী কিবা ভরিয়া রতন।
শ্যাম চাপ শিরে দিয়া বাথিছে মদন॥
চক্রবাক-যুগ নিশি বিচ্ছেদের ভরে।
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে॥
কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ।
যুবা কুলানন্দ হৃদে বালক জীবন॥

উদর—

মলয়া কুসুম কেশর বাণী সার।
একত্রে ছানিয়া কৈল উদর সঞ্চার॥

কটিদেশ—

যতেক বাথান করি ততোধিক চারু।
হরের নিকটে যেন রাখিছে ডম্বরু॥

'শিবের পূজায় স্থলী'কে 'চন্দনের মাঝে কিবা মৃগ পদ চিন।' বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উরু— রাম কদলী।

গমন— পদ পরশনে রেণু রক্তবর্ণ হয়। সিন্দুর বলিয়া কুল রমণী পরয়,॥

এই বর্ণনা পড়িয়া বৈষ্ণব কবির — যাঁহা যাঁহা কোমল পদতল চলচলই,
তাঁহা তাঁহা থল কমল থলথলই। — স্মরণ হইবে।

রূপবর্ণনায় তিনি বৈষ্ণব কবি এবং মধ্যযুগের সকল বড় বড় কবিরই অনুকরণ করিয়াছেন মনে হইবে, কিন্তু তাহার অনুকরণ সেই সকল কবিদের বর্ননাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। আলাওয়াল তদীয় কাব্যে তদানীন্তন সমাজের যে ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয়।

উৎসবাদিতে তৎকালীন প্রচলিত রেওয়াজের হুবহু ছবি পাই। পদ্মাবতীর জন্মোৎসবে সাত দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দরিদ্রগণ দক্ষিণা পাইল। ঘটা করিয়া রাশী নক্ষত্র গনণা করিয়। নাম রাখা হইল। কোষ্টি পত্র তৈরীর রেওয়াজ হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। রাজকন্যাকে পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় পাঠান হইত। তখনকার দিনেও শৈশব হইতেই লেখাপড়ার চর্চার রেওয়াজ ছিল; শুধু তাহাই নহে—স্ত্রীশিক্ষারও প্রচলন ছিল। ধুমধাম করিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে তীর্থ স্নানে যাওয়ারও রেওয়াজ ছিল।

তখনকার দিনে বড়লোকদের মধ্যে হাতীর দাঁতের অলঙ্কার পরিধানের রেওয়াজ ছিল। গুজরাতী চুড়ি, অঙ্গুরীয়, বলয়, বাহুবেঢ়, শিথী, অঙ্গদ, কঙ্কন, হার এই সকল অলঙ্কার রমণীকুলের দেহের শোভা বৃদ্ধি করিত। কাঁচুলী, নানা বর্ণের শাড়ী শিরবাস ও প্রচলিত ছিল। শিরেতে সিন্দুর, কানে কানফুল, চোখে অঞ্জন ও অঙ্গে আগর চন্দন, চুয়া কুসুম, কস্তুরী ইত্যাদি সুগন্ধিলেপন ও পুষ্পধারণ প্রসাধন প্রক্রিয়া একেবারে আধুনিক না হইলে ইহার পুরাতন সংস্করণ।

পাখী পোষা, বিড়াল পোষা, পাথীকে বুলিশিখানো, এবং নানাবিধ খেলার সংবাদ পাওয়া যায়—আলাওয়ালের বর্ণনায়। 'সব সখিগণের হাড়, এড়িয়া'— সরোবর মধ্যে ডুব দিয়া উহার সন্ধান করায় যে জল-ক্রীড়ার কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অধুনা প্রচলিত নয় ।

কন্যাদের বাপের বাড়ীতে খুব অল্পদিন কাটাইতে হয়, অতঃপর শ্বশুরালয়ে গেলে 'নিজগত না হইব আপ ইচ্ছা ধন।' সেখানে শাশুড়ী ননদী বাক্য বিয বরিষণ।' একথা কবি কঙ্কন, ভারতচন্দ্র এবং বৈষ্ণব কবি কেহই বাদ দেন নাই। কিন্তু আলাওয়াল ইহার মুক্তির উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, 'স্বামী সেবা ভক্তি মাত্র উপায় কারণ।'

কোথাও যাত্রার সময় হাচি টিকটিকি শুভাশুভ জ্যোতিষপ্রসঙ্গ মানিয়া চলা তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল, এখনও তাহা আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

চলিতে কুশল ভাল দেখিল বিদিত।
ধেনু বৎস সংযোগে দক্ষিণে উপস্থিত॥
দধিলে, দধিলে করি ডাকে গোয়ালিনী।

পূর্ণকুম্ভ দেখিলেও সুভগা রমণী ॥
নাগ শিরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জন।
বামেতে শৃগাল ফিরি করে নিরীক্ষণ॥
পুষ্পের পশার লই সম্মুখে মালিনী।
শিরপরে মণ্ডলয়-সাচন শঙ্খিণী॥
আইস আইস করিয়া সম্মুখে করে বোল।

এইসমস্ত শুভ লক্ষণ দেখিয়া শুভলগ্নে নৃপতি পদ্মিনী সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে ও আচার পদ্ধতিতে যে কবি যথেষ্ট ওয়াকেফহাল ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিবাহ উৎসব স্ত্রীআচার ও অপরাপর বর্ণনায়। রাজভোগ রাজসভায় গুণীগণের সমাদর তদানীন্তন সমাজের রুচি ও শিক্ষিত মান্যতার পরিচয় বহন করে।

তখনকার দিনের বিচার পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় যোগী রত্নসেনের 'শালে' দেওয়ার হুকুম হইতে।

যুদ্ধ, ঘোড় দৌড় ইত্যাদিতেও কবি নিজেই অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই এসবের বর্ণনায় তাহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'চৌগান' খেলা ও ঘোড় দৌড়ের নানা রকমের নাম ও কসরত বাংলাদেশে ত বটেই বাংলা সাহিত্যেও নূতন। আলাওয়ালকে এব্যাপারে প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। 'দোগাম', 'গোমগাম', 'সাহা', 'রফা', 'রহি', 'অনুপাম', 'বোহা', 'দোলক', 'কুণ্ডলী' এসমস্ত বিভিন্ন নামের নানা রকমের চালী বা দৌড়ের নিখুত বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। এসকল ব্যাপারে কবি ফারসী লেখকদের কাছে ঋণী— একথা বলাই বাহুল্য।

স্বপ্নদর্শন ও বিজ্ঞান, কাকুছ পক্ষীর গল্প, চৌগান খেলা, ঘোড়া ও হস্তীর বিভিন্ন খেলা— এইসমস্ত যেমন ফারসীর প্রভাবের ফল, তেমনি, সিন্ধ, কাটিয়া নায়িকার ঘরে গমন ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস — প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাহিণী স্মরণ করাইয়া দেয়। বিলাপ, বারমাসী, ধুয়া — এসমস্ত প্রচলিত বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে পত্রে প্রেরণাদিও লক্ষ্যণীয়। সিদ্ধাচার্যদের মহিমা বর্ণনায় তদানীন্তন সমাজ যোগসিদ্ধাদের প্রভাবের কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সেকালের ধর্মবিশ্বাস, সত্যাসত্য নিরূপণ ইত্যাদির কথাও বলিতে কবি কসুর করেন নাই। রাজরাজড়াদের আবাসস্থল, শিকার গমন, যুদ্ধ গমন, আনুষঙ্গিক অপরাপর রেওয়াজের বর্ণনায় যেমন অতিরঞ্জন আছে বলিয়া মনে হয় না, তেমনি, সিংহল বর্ণ না ও চিতাওর বর্ণ না — এসকল অধ্যায়ে কবি তাঁহার কবিত্ব উজাড় করিয়া দিয়া সত্য-মিথ্যার বাস্তব কল্পনার এক রহস্যময় ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি প্রবাদবাক্য যেমন সমাজে প্রচলিত হইয়া আছে, তেমনি আলাওয়াল কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ ও উপদেশ বাক্যের প্রয়োগে তাঁহার বক্তব্য স্ফুটতর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিছু উদ্ধৃত করি:

(১) হৃদয় নয়ন যার না হৈছে প্রকাশ।
বুদ্ধিমানে তার বাক্য না করে বিশ্বাস॥
(২) পরশী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।
নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাহি ঠাই॥
(৩) যেই ঘরে আছয় মার্জার কালরূপ।
পক্ষীর নিকট মৃত্যু জানিও স্বরূপ॥
(৪) পিঞ্জর হইতে পক্ষী হইলে মুকল।
নানা যত্ন করিলে না হয় করতল॥
(৫) পণ্ডিত হইয়া কেহ গর্ব না করিও।
আপনাকে সব হৈতে হীণ আকলিও॥
(৬) প্রথমে নিশ্চিন্তে রইলে কর্ম অকুশল।
গ্রীবা বদ্ধ হইলে রোদনে কিবা ফল॥
(৭) আহার নিমিত্ত হয় বান্ধব বিচ্ছেদ।
মিত্রজন সঙ্গে সেই করে শত্রুক্রভেদ॥
(৮) যেই গুণী বিনি জিজ্ঞাসিলে কথা।
সে বাক্য মাটির তুল্য জানিও সর্বথা॥
(৯) যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন।
তাবতে মরম না জানয় কোনজন॥
(১০) অগ্নিদাহ ঘায়ে যেন লাগিল লবন॥

(১১) গর্ভ পাপ পয়োধর না হয় গোপন।
কাল পূর্ণ হৈলে হয় বেকত আপন॥
(১২) পাচ্ছে না চিন্তিয়া যেই জনে করে কর্ম।
সেই যে নিশ্চয়ই জান হতমুখ ধর্ম॥
(১৩) কিবা রাণী কিবা দাসী কিবা অন্যজনী।
যাকে স্বামী দয়া করে সেই যে ভার্যানী॥
(১৪) পণ্ডিতের অসত্য বচন বজ্রাঘাত॥
(১৫) নদনদী আসিপুনি সমুদ্রে মিলায়।
অপার গম্ভীর সিন্ধু কোথায় না যায়॥
(১৬) সহিয়া বিরহ দুঃখ রাথ ধর্ম নেম।
যতেক দহায় ঘনবৃদ্ধি পায় হেম॥
(১৭) একচিত্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয়।
তাহার বাঞ্ছিত সব বিধাতা পুরায়॥
(১৮) বিচারি চাহিল যার অঙ্গে আছে পাখা।
আজি যদি রাখি কালি না যাইব রাখা॥
(১৯) যে জন পরের হয় না রহিব এথা॥
(২০) বিনি সিন্ধু, না দি চোরে নাহি পায় ধন।
(২১) জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে।
পুনি কোথা মরণ কেমরে কেমারে॥
(২২) ঈশ্বরের আপদ আপনাশিরে লয়।
সেই সে সেবক ধন্য নীতিশাস্ত্রে কয়॥
(২৩) তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়।
ছেদিলে শতেকবার দুইখণ্ড নয়॥

এরূপ আরো বহু উপমা দেওয়া চলে।

অলঙ্কার শাস্ত্রে যে কবির কতদূর অধিকার ছিল, তাহা প্রকট হইয়া রহিয়াছে তাঁহার কাব্যের প্রতিছত্রে।

মোটকথা, আলাওয়াল মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে একজন বহু ভাষাবিদ নানা শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত। তাঁহার কাব্য-অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও তাহাতে তাঁহার মৌলিকত্ব ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন সুস্পষ্ট। তাঁহাকে কেবল অনুবাদের কবি বলিলে অবিচার করা হইবে।